

## ত্রিতীয় অধ্যায়

# স্বাধীন বাংলাদেশ

১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের জন্য বাঙালিরা অনেক দুঃখকষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭০ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরুচিশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। পাকিস্তানি শাসকদের শোষণের হাত থেকে মুক্তি লাভের আশায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আওয়ামী লীগকে স্বতৎকৃতভাবে ভোট দেয়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা প্রদানের ক্ষেত্রে নানারকম ঘড়্যবন্ধ শুরু করে। ১৯৭১ সালের ১ লা মার্চ পাকিস্তানের তদনীন্তন প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনৰ্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৩ মার্চ অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ভাষণে জনগণকে মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানান। ২৫শে মার্চ নিরস্ত্র জনগণের উপর পাকিস্তান সেনাবাহিনী আক্রমণ চালায়। ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন এবং স্বাধীনতার সাধিবিধানিক ঘোষণাপত্র গ্রহণের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। দীর্ঘ নয় মাস এক রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ৯৩ হাজার সদস্য এই দিন আত্মসমর্পণ করে। বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন-সার্বভৌম ‘বাংলাদেশ’ নামক রাষ্ট্রটির অভ্যন্তর ঘটে। স্বাধীনতা লাভের পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ার কঠিন চ্যালেঞ্জ বঙ্গবন্ধু সরকারকে মোকাবিলা করতে হয়। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে পরিবার-পরিজনসহ হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে স্বাধীনতা বিরোধীদের উত্থান ও সামরিক শাসনের সূত্রপাত ঘটে। বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৯০ সালে সৈয়েরাচারী শাসনের পতন ঘটিয়ে গণতন্ত্রের পুনর্যাত্রা শুরু হয়। দেশ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যায়। এ অধ্যায়ে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট, অভ্যন্তর, পুনর্গঠন, সামরিক শাসনামল, গণতন্ত্রের পুনর্যাত্রা ও আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রা সম্পর্কে অবহিত হব।

### এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা –

- বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ৭ই মার্চের ভাষণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- স্বাধীনতাযুক্ত পরিচালনায় মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারব;
- মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ছাত্র, পেশাজীবী, নারী, গণমাধ্যম, সাংস্কৃতিক কর্মী ও সাধারণ মানুষের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারব;
- স্বাধীনতা অর্জনের ঘটনাপ্রবাহে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের অবদান মূল্যায়ন করতে পারব;
- স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিশ্বজনমত সৃষ্টি ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারব;
- মহান মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক তাত্পর্য বিশ্লেষণ করতে পারব;
- স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শের প্রতি উদ্দৃষ্ট হব;
- যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার বর্ণনা দিতে পারব;
- ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণয়নের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ১৯৭৫ সালে জাতির পিতা ও চার জাতীয় নেতার হত্যা এবং রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের বর্ণনা করতে পারব;
- ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট পরবর্তী সামরিক শাসনের উত্থান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমানের হত্যা এবং পরবর্তী নির্বাচন বর্ণনা করতে পারব;
- ১৯৮২ সালের এরশাদের সামরিক শাসন ও তার প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারব;
- ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং গণতন্ত্রের পুনর্যাত্রার বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের উজ্জ্বলযোগ্য আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রা বর্ণনা করতে পারব;
- দেশের প্রতি ভালোবাসা, গণতন্ত্র এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শুন্দৰ পোষণ করব।

### পরিচ্ছেদ ২.১ : মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি, সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যন্তর

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নিরজনশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। প্র ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি রেমনার রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগ দলীয় প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্যগণকে ১১

হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শপথ পাঠ করান। এতে জনগণের সম্পদ ৬ মফা ও ১১ মফাৰ প্রতি অবিচল ধারার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। পাকিস্তানি সামরিক শাসকচক্র আওয়ামী জীগাকে ক্ষমতা হস্তান্তরে নানা চক্রান্ত ঘটক করে। ১৯৭১ সালের তুরা মার্চ ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিবেশের অধিবেশন আহ্বান করেন। পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতৃত্বালিকার আঙ্গী ভূট্টো ঢাকায় অধিবেশনে ঘোষণান করতে অঙ্গীকার করেন। অন্যান্য সদস্যকেও তিনি হয়কি দেন। এসবই ছিল ভূট্টো-ইয়াহিয়ার বড়বড়ের ফল। ইয়াহিয়া খান ১লা মার্চ ভূট্টোর ঘোষণাকে অভ্যন্তর দেখিয়ে তো রা মার্চের অধিবেশন অনিদিষ্টকালের জন্য ঝুঁপিত ঘোষণা করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে কোনো থকার আলোচনা না করে অধিবেশন ঝুঁপিত করায় পূর্ব বাংলার জনগণ বিক্ষেপে ফেটে পড়ে। অধিবেশন ঝুঁপিত করার প্রতিবাদে সর্বদলীয় সংঘাত পরিষবদ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে ২২৩ মার্চ ঢাকায় এবং তুরা মার্চ সাম্রাজ্য দেশে হরতাল পালিত হয়। ফলে সকল সরকারি কার্যক্রম অচল হয়ে পড়ে। হরতাল ঢাকালে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর শুলিতে বহুলোক হতাহত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসহযোগ আলোচনের ডাক দেন। এমন পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এ ভাষণে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-শাসন, বক্ষনার ইতিহাস, নির্বাচনে জয়ের পর বাঞ্ছালির সাথে প্রতারণা ও বাঞ্ছালির রাজনৈতিক ইতিহাসের পটভূমি ভূলে ধরেন। বিশ্ব ইতিহাসে বিশেষ করে বাঞ্ছালি জাতির ইতিহাসে এ ভাষণ এক শ্বরশীয় দলিল। জাতুর স্পর্শে বাঞ্ছালি জাতিকে বীরের জাতিতে জগপ্রকৃতি করার এই ভাষণ বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ইউনেক্সো ২০১৭ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণকে ‘ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টেরি হেরিটেজ’ (World Documentary Heritage) ‘বিশ্ব প্রামাণ্য দলিল’ হিসেবে বীকৃতি দিয়েছে। এই ভাষণ ইন্টারন্যাশনাল ‘মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড ডেক্সিটার’- এ জনপ্রশংসন ডকুমেন্টেরি ঐতিহ্য হিসেবে ইউনেক্সো অভর্তৃক করেছে।

### ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ও স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘাস্তা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এ ভাষণে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-শাসন, বক্ষনার ইতিহাস, নির্বাচনে জয়ের পর বাঞ্ছালির সাথে প্রতারণা ও বাঞ্ছালির রাজনৈতিক ইতিহাসের পটভূমি ভূলে ধরেন। বিশ্ব ইতিহাসে বিশেষ করে বাঞ্ছালি জাতির ইতিহাসে এ ভাষণ এক শ্বরশীয় দলিল। জাতুর স্পর্শে বাঞ্ছালি জাতিকে বীরের জাতিতে জগপ্রকৃতি করার এই ভাষণ বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ইউনেক্সো ২০১৭ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণকে ‘ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টেরি হেরিটেজ’ (World Documentary Heritage) ‘বিশ্ব প্রামাণ্য দলিল’ হিসেবে বীকৃতি দিয়েছে। এই ভাষণ ইন্টারন্যাশনাল ‘মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড ডেক্সিটার’- এ জনপ্রশংসন ডকুমেন্টেরি ঐতিহ্য হিসেবে ইউনেক্সো অভর্তৃক করেছে।



চিত্র ২.১ : ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ দান

৭ই মার্চের ভাষণ থেকে বাঙালি ঐক্যবন্ধ হওয়ার প্রেরণা ও মুক্তিযুদ্ধের নির্দেশনা পায়। এ ভাষণের পরেই বাঙালি জাতির সামনে একটি মাত্র গঞ্জব্য নির্ধারণ হয়ে যায়, তা হলো ‘স্বাধীনতা’। ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতার ডাক দেন, সে ডাকেই বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। বঙ্গবন্ধুর ভাষণে প্রতিবর্তী করণীয় ও স্বাধীনতা লাভের দিকনির্দেশনা ছিল—‘প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শক্তির মোকাবিলা করতে হবে।’ তিনি আরও বলেন, “কন্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো, এদেশের মানুষকে মৃত্যু

### কাজ

দলগত : ৭ই মার্চের ভাষণের কী কী বিষয় মুক্তিযোৰ্জনের উন্নত করছে? তা উল্লেখ কর।

করে ছাড়ব, ইন্দ্ৰিয়াহু। এবাবের সঞ্চাম আমাদের মুক্তির সঞ্চাম, এবাবের সঞ্চাম স্বাধীনতার সঞ্চাম। জয়বাহ্লা।” এ ভাষণে তিনি প্রতিবেদ্য সঞ্চাম, মুক্তের কলা-কৌশল ও শক্তি মোকাবিলার উপর সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেন। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের স্বাধীনতার ডাকে সাড়া দিয়ে জনগণ মুক্তিযুদ্ধে বৌপিয়ে পড়ে। ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ‘অগারেশন সার্ট লাইট’ নামক পরিকল্পনার মাধ্যমে নৃশংস গণহত্যা শুরু করে। বাঙালিয়া পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণের বিস্তৃকে ঝুঁথে দাঁড়ায়।

## স্বাধীনতার আনন্দানিক ঘাত্তা

৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত কর্মসূচি এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের আহ্বানের প্রতি সাড়া দিয়ে সকল স্তরের জনগণ ঐক্যবন্ধ হয়। পূর্ব বাংলার সকল অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা বন্দ হয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা কোত্তিক দেখে ইয়াহিয়া খান ঢাকার আসেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনা করতে। এ সময় ভুট্টোও ঢাকায় আসেন। অগ্রদিকে গোপন আলোচনার নামে কালকেপণ করে পঞ্চম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও গোলাবাদ এনে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক আক্রমণের প্রস্তুতি থাই করা হয়। ১৭ই মার্চ টিকা খান ও রাও ফরমান আলী ‘অগারেশন সার্টলাইট’ নামক কর্মসূচির মাধ্যমে বাঙালির ওপর নৃশংস হত্যাকাণ্ড পরিচালনার নীলমস্তো তৈরি করে। ২৫শে মার্চ রাতে শুব্দবীর ইতিহাসে বর্ষাতম গণহত্যা, ‘অগারেশন সার্টলাইট’ শুরু হয়। ইয়াহিয়া ও ভুট্টো ২৫শে মার্চ গোপনে ঢাকা ভ্যাগ করেন। ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর বৌপিয়ে পড়ে। হত্যা করে বহু মানুষকে। পাকিস্তানি বাহিনী



চিত্র ২.২ : ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের গণহত্যা

ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ ক্যাম্প, পিলখানা ইউনিয়ার ক্যাম্প ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন পুরুষপূর্ণ জায়গায় আক্রমণ চালায় ও নৃশংসভাবে গণহত্যা ঘটায়। বাংলাদেশের ইতিহাসে ২৫শে মার্চের রাত ‘কালোত্তি’ নামে পরিচিত। এ দিবসটি এখন ‘জাতীয় গণহত্যা দিবস’ হিসেবে চীকৃত। ২৫শে মার্চের কালোত্তিতেই অর্ধাং ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং ওয়ারেন্সেসহোগে তা চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দেন। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা শোনায়াত্রই চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন জেলার জনগণ প্রতিবেদ্য গড়ে তোলে। শুরু হয় পাকিস্তানি সশস্ত্র সেনাদের সঙ্গে বাঙালি, আনসার ও নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের এক অসম শড়ই, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে মহান মুক্তিযুদ্ধ নামে পরিচিত। স্বাধীনতা ঘোষণার পরগতই ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে আনুমানিক রাত ১টা ৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রেক্ষাত করে গোপনে পঞ্চম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়।

## স্বাধীনতা ঘোষণা

প্রেক্ষাত হওয়ার পূর্বমুহূর্তে অর্ধাং ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে (অর্ধাং ২৫শে মার্চ রাত ১২টার পর) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ঘোষণাটি ছিল ইংরেজিতে, যাতে বিশ্ববাসী ঘোষণাটি বুঝতে পারেন।

স্বাধীনতা ঘোষণার বাংলা অনুবাদ : “ইহাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের

জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি যে, যে যেখানে আছে, যাহার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে বুখে দাঁড়াও, সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ কর। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও।” স্বাধীনতার এ ঘোষণা বাংলাদেশের সকল স্থানে তদানীন্তন ইপিআর এর ট্রাঙ্গমিটার, টেলিগ্রাম ও টেলিফ্রিটারের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ২৬শে মার্চ দুপুরে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ. হানান চট্টগ্রামের বেতার কেন্দ্র থেকে একবার এবং সন্ধ্যায় কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে দ্বিতীয়বার প্রচার করেন। বঙ্গবন্ধুর হেফতার হওয়ার কারণে ২৭শে মার্চ সন্ধ্যায় একই বেতার কেন্দ্র হতে জিয়াউর রহমান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। তাঁর স্বাধীনতার ঘোষণা এবং এর বাণিজি সামরিক, আধা সামরিক ও বেসামরিক বাহিনীর সমর্থন ও অংশগ্রহণের খবরে স্বাধীনতাকামী জনগণ উজ্জীবিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

### মুক্তিযুদ্ধের সূচনা এবং মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রম

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ অপারেশন সার্চলাইট শুরুর পূর্বে বঙ্গবন্ধু তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের সাথে উদ্ভৃত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। পাকিস্তানি বাহিনী আক্রমণ করলে তা প্রতিহত করার নির্দেশ দেন। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে সরকার গঠন ও মুক্তিযুদ্ধের সময়ে করণীয় বিষয়ে শুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে মুজিবনগর সরকার গঠন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার আম্বকাননকে নামকরণ করা হয় মুজিবনগর। মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনা, সুসংহত করা এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমত গঠনের লক্ষ্যে ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল ‘মুজিবনগর সরকার’ গঠন করা হয়। এটি ছিল প্রথম বাংলাদেশ সরকার। এই দিনই আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয় ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা আদেশ’। মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল। শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগর স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের কাঠামো ছিল নিম্নরূপ :

১. রাষ্ট্রপতি ও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
২. উপ-রাষ্ট্রপতি : সৈয়দ নজরুল ইসলাম (বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি)
৩. প্রধানমন্ত্রী : তাজউদ্দীন আহমদ
৪. অর্থমন্ত্রী : এম. মনসুর আলী
৫. স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী : এ. এইচ. এম. কামালুজ্জামান
৬. পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী : খন্দকার মোশতাক আহমেদ

স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে উপদেশ ও পরামর্শ প্রদানের জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (তাসানী ন্যাপ) মণ্ডলান আদুল হামিদ খান তাসানী, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (মোজাফ্ফর ন্যাপ) অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ, কমিউনিস্ট পার্টির কমরেড মণি সিৎ, জাতীয় কংগ্রেসের শ্রী মনোরঞ্জন ধর, তাজউদ্দীন আহমদ (বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী) ও খন্দকার মোশতাক আহমেদ (বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী)-কে নিয়ে মোট ৬ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধে প্রধান সেনাপতি ছিলেন কর্নেল (অব.) এম. এ. জি ওসমানী।

### কাজ

দলগত : স্বাধীনতা ঘোষণার মূল কথা কী?

এর বিষয়বস্তু তৈরি কর।

দলগত : বাংলার কেন স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করে, তা বর্ণনা কর।

## মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রম

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য দ্বারা মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়।

বাঙালি কর্মকর্তাদের নিয়ে এ সরকার প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করেছিল। এতে মোট ১২টি মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ছিল। এগুলো হলো—প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, অর্থ, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়, সাধারণ প্রশাসন, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ বিভাগ, আগ ও পুনর্বাসন বিভাগ, প্রকৌশল বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও যুব ও অভ্যর্থনা শিবির নিয়ন্ত্রণ বোর্ড। মুজিবনগর সরকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহর—কলকাতা, দিল্লি, লন্ডন, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, স্টকহোম প্রভৃতিতে বাংলাদেশ সরকারের মিশন স্থাপন করেন। এসব মিশন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রচারণা ও আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে। সরকার বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বিশেষ দৃত হিসেবে নিয়োগ দেয়। তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব নেতৃত্ব ও জনমতের সমর্থন আদায়ের জন্য কাজ করেন। ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সামরিক, বেসামরিক জনগণকে নিয়ে একটি মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সরকার বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে ১১ জন সেক্টর কমান্ডার নিয়োগ করেছিল। এ ছাড়া বেশ কিছু সাব-সেক্টর এবং তিনটি ব্রিগেড ফোর্স গঠিত হয়। এসব বাহিনীতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত বাঙালি সেনা কর্মকর্তা, সেনা সদস্য, পুলিশ, ইপিআর, নৌ ও বিমানবাহিনীর সদস্যগণ যোগদান করেন। প্রতিটি সেক্টরেই নিয়মিত সেনা, গেরিলা ও সাধারণ যোদ্ধা ছিল। এরা মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিফৌজ নামে পরিচিত ছিল। এসব বাহিনীতে দেশের ছাত্র, যুবক, নারী, কৃষক, রাজনৈতিক দলের কর্মী—সমর্থক, শ্রমিকসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ অংশ নিয়েছিল। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ শেষে যোদ্ধাগণ দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পাকিস্তানি সামরিক ছাউনি বা আস্তানায় হামলা চালায়। মুক্তিযুদ্ধে সরকারের অধীন বিভিন্ন বাহিনী ছাড়াও বেশ কয়েকটি বাহিনী দেশের অভ্যন্তরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠেছিল। এসব সংগঠন স্থানীয়ভাবে পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। এক্ষেত্রে টাংগাইলের কাদেরিয়া বাহিনীর কথা উল্লেখ করা যায়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধাগণ মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে দেশকে পাকিস্তানিদের দখলমুক্ত করার জন্য রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছেন, দেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছেন, অনেকে আহত হয়েছেন।

## মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ জনগণ ও পেশাজীবীদের ভূমিকা

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ নিরস্ত্র জনগণের ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আক্রমণ চালালে বাঙালি ছাত্র, জনতা, পুলিশ, ইপিআর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস) সাহসিকতার সাথে তাদের বিরুদ্ধে বৃথৎ দাঁড়ায়। বিনা প্রতিরোধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে বাঙালিরা ছাড় দেয়নি। দেশের জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে বহু মুক্তিযোদ্ধা বিভিন্ন রূপাঙ্গনে শহিদ হন। আবার অনেকে মারাত্মকভাবে আহত হন। তাই মুক্তিযোদ্ধাদের এ খণ্ড কোনোদিন শোধ হবে না। জাতি চিরকাল মুক্তিযোদ্ধাদের সূর্যসঙ্গান হিসেবে মনে করবে। মুক্তিযোদ্ধারা দেশকে শত্রুমুক্ত করার লক্ষ্যে মৃত্যুকে

তুচ্ছ মনে করে যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন দেশপ্রেমিক, অসীম সাহসী এবং আত্মাগে উদ্বৃদ্ধ যোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিক, ইপিআর, পুলিশ, আনসার, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র—ছাত্রীসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের বাঙালি অংশগ্রহণ করে। তাই এ যুদ্ধকে ‘গণযুদ্ধ’ বা ‘জনযুদ্ধ’ও বলা যায়। ১০

কাজ

দলগত : মুজিবনগর অস্থায়ী সরকারের কার্যক্রম চিহ্নিত কর।

কাজ

দলগত : জাতি কেন মুক্তিযোদ্ধাদের স্মান করবে, সূর্যসঙ্গান মনে করবে— এটি ব্যাখ্যা কর।

দলগত : মুক্তিযুদ্ধকে গণযুদ্ধ বা জনযুদ্ধ বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মূল নিয়ামক শক্তি ছিল জনগণ। তাই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ছাত্র-ছাত্রী, পেশাজীবী, নারী, সামুদ্রিক কর্মীসহ সর্বস্তরের জনসাধারণ নিজ নিজ অবস্থান থেকে যুদ্ধে ফৌপিয়ে পড়ে। জীবনের মায়া ত্যাগ করে দেশকে শক্তিমুক্ত করে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে।

## রাজনৈতিক দল

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী প্রধান রাজনৈতিক দল হলো বাংলাদেশ আওয়ামী জীগ। রাজনৈতিক নেতৃত্বই মুক্তিযুদ্ধের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করে। আওয়ামী জীগ প্রথমে পূর্ববাংলার জনগণকে স্বাধীকার আন্দোলনে সংগঠিত করে। এরপর ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে নিরজকুশ বিজয় লাভের পর জনগণকে স্বাধীনতা অর্জনে উৎসুক করে। ফলে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাকে সাড়া দিয়ে জনগণ মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার) গঠন করে বঙ্গবন্ধুর ২৬শে মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণাকে ১০ই এপ্রিল ১৯৭১ আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে। এতে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট, অপরিহার্যতা এবং এর ভবিষ্যৎ রূপরেখা প্রণীত হয়। ২৫শে মার্চের পর রাজনৈতিক নেতৃত্ব সংগঠিত হয়ে সরকার গঠন, মুক্তিবাহিনী গঠন, বিদেশে জনমত সৃষ্টি ও সমর্থন আদায়, যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ এবং জনগণের মনোবল আটুট রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব মুক্তিযুদ্ধকে সফল করার ক্ষেত্রে সকল শক্তি, মেধা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়। মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদান, ভারতে ১ কোটি শরণার্থীর আগ ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা, মুক্তিযোদ্ধা ও গেরিলা যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পরিচালনা এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিশ্ব জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল সরকার ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় আওয়ামী জীগ ছাড়াও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- ন্যাপ (তাসানী), ন্যাপ (মোজাফ্ফর), কমিউনিস্ট পার্টি, জাতীয় কংগ্রেস ইত্যাদি। এসব দলের নেতা ও কর্মীরা অনেকেই সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাকবাহিনীর সমর্থনে মুসলিম জীগ, জামায়াতে ইসলামী, পিডিপিসহ কতিপয় দল মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে। দলগুলো শান্তি কমিটি, রাজাকার, আলবদর ও আলশামস নামক বিশেষ বাহিনী গঠন করে। এসব বাহিনী হত্যা, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, নারীর সন্ত্রমহানির মতো মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল। স্বাধীনতাবিরোধী এ বাহিনীগুলো মুক্তিযোদ্ধা ছাড়াও বাঙালিদের মেধাশূন্য করার উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর পরিকল্পিতভাবে এদেশের শ্রেষ্ঠ বৃক্ষজীবীদের হত্যা করে।

## ছাত্র সমাজ

পাকিস্তানের চারিশ বছরে বাঙালি জাতির স্বার্থ-সংগ্রহ সকল আন্দোলনে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছে এদেশের ছাত্র সমাজ। ১৯৪৮-১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬২ ও ১৯৬৪ সালের শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে ছয় দফার আন্দোলন, ১৯৬৮ সালে ১১ দফার আন্দোলন, উন্সত্তরের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর নির্বাচন ও ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে ছাত্রসমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিরাট অংশ সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। অনেকে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করে। মুক্তিবাহিনীতে একক গোষ্ঠী হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। মুক্তিবাহিনীর

কাজ

দলগত : মুক্তিযুদ্ধে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব উত্তোল কর।

দলগত : মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীদের বাঙালিরা ঘৃণা করবে কেন?

অনিয়মিত শাখার এক বিরাট অংশ ছিল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। মুক্তিযুদ্ধের একপর্যায়ে মুজিব বাহিনী গঠিত হয়েছিল মূলত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে। ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা বিভিন্ন এলাকায় সংগঠিত হয়ে মুক্ত অংশগঠন করে। মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র সমাজের মহান আত্মত্যাগ ব্যক্তিত স্বাধীনতা অর্জন কর্তৃপক্ষে হতো।

কাজ

সম্পত্তি : মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মত্যাগ ও অবদান চিহ্নিত কর।

### পেশাজীবী

সাধারণ অর্থে যারা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত তারাই হলেন পেশাজীবী। পেশাজীবীদের মধ্যে উচ্চাখ্যযোগ্য হলেন—শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিল্পী, সাহিত্যিক, প্রযুক্তিবিদ, আইনজীবী, সাহাবাদিক ও বিজ্ঞানীসহ বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে এদের ভূমিকা ছিল অনন্য ও গৌরবন্দীস্থ। পেশাজীবীদের বড় অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। পেশাজীবীরা মুজিবনগর সরকারের অধীনে পরিকল্পনা সেল গঠন করে বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের তথ্য সরবরাহ, সাহায্যের আবেদন, বিভিন্ন আঙ্গর্জাতিক কোরামে বক্তব্য প্রদান, শরণার্থীদের উত্তোলন ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। পেশাজীবীদের মধ্যে অনেকে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হন।

### মুক্তিযুদ্ধে নারী

মুক্তিযুদ্ধে নারীদের ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল। ১৯৭১ সালের মার্চের প্রথম খেকেই দেশের প্রতিটি অঞ্চলে যে সক্রাম পরিষদ গঠিত হয়, তাতে নারীদের বিশেষ করে ছাত্রীদের অংশগঠন ছিল স্বতঃস্মৃত। মুক্তিযোৱাকা শিবিরে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা অস্ত্রচালনা ও পেরিলা মুদ্দের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। অগ্রণীকে সহযোগ্য হিসেবে আহত মুক্তিযোৱাদের সেবা—শুল্কা, মুক্তিযোৱাদের আশ্রয়দান ও তথ্য সরবরাহ করে যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এদেশের অগণিত নারী মুক্তিসেনা। পাকিস্তানি

কাজ  
সম্পত্তি : মুক্তিযুদ্ধে নারীর  
অবদান মূল্যায়ন কর।

হানাদার বাহিনী কর্তৃক ধর্ষিত হন প্রায় তিনি শাখা মা-বোন। তাঁরাও মুক্তিযোৱাদের সহযোগী।



চিত্র ২.৩ : যুদ্ধ প্রশিক্ষণে নারী

তাদের ভ্যাগের স্বীকৃতি হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারিভাবে তাঁদের ‘বীরাজানা’ উপাধিতে ভূষিত করেন। আওয়ামী লীগ সরকার ২০১৬ সালে তাঁদের মুক্তিযোৱাকা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

### গণমাধ্যম

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম। সংবাদপত্র ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ২৬শে মার্চ চট্টগ্রাম বেতারের শিল্পী ও সংকৃতি কর্মীরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু করেন। পরে এটি মুজিবনগর সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সংবাদ, দেশাভিবেদক গান, মুক্তিযোৱাদের বীরত্বগাথা, রণাঙ্গনের নানা ঘটনা দেশ ও জাতির সামনে ভূলে ধরে সাধারণ মানুষকে যুদ্ধের প্রতি অন্তর্প্রাপিত করে। মুক্তিযোৱাদের সাহস জুগিয়ে বিজয়ের পথ সুগম করে। এছাড়া, মুজিবনগর সরকারের প্রচার সেশনের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত ‘জয়বাংলা’ পত্রিকা মুক্তিযুদ্ধে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে।

### জনসাধারণ

সাধারণ জনগণের সাহায্য-সহযোগিতা ও স্বাধীনতার প্রতি ঐকাণ্ডিক আকাঙ্ক্ষার ফলেই মাত্র নয় মাসের যুদ্ধে বাংলাদেশ

স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়েছে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মুক্তিমেয় এদেশীয় দোসর ব্যতীত সবাই কোনো না কোনোভাবে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সাধারণ মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের অশ্রয় দিয়েছে, শত্রুর অবস্থান ও চলাচলের তথ্য দিয়েছে, খাবার ও ঔষধ সরবরাহ করেছে, সেবা দিয়েছে ও খবরাখবর সরবরাহ করেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ জনগণের পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগণও অংশগ্রহণ করে। তাদের অনেকে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হন। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিপ লাখ শহিদের মধ্যে সাধারণ মানুষের সংখ্যা ছিল অধিক। তাদের রক্তের বিনিময়েই আমাদের আজকের স্বাধীন মানচিত্র, লাল-সবুজ পতাকা।

### প্রবাসী বাঙালি

প্রবাসী বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেন। বিভিন্ন দেশে তারা মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন। বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায়ে বিভিন্ন দেশের পার্শ্বামেন্ট সদস্যদের নিকট ছুটে গিয়েছেন। তাঁরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেছেন। পাকিস্তানকে অস্ত্র-গোলাবারুদ সরবরাহ না করতে বিশের বিভিন্ন সরকারের নিকট প্রবাসী বাঙালিরা আবেদন করেছেন। এক্ষেত্রে ব্রিটেন ও আমেরিকার প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনে তাঁরা নিরলস কাজ করেছেন।

### শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী

মুক্তিযুদ্ধের মূল নিয়ামক শক্তি ছিল জনগণ। তথাপি যুদ্ধে মানুষকে উদ্বৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী ও বিভিন্ন সংস্কৃতি কর্মীর অবদান ছিল খুবই প্রশংসনীয়। পত্র-পত্রিকায় লেখা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে খবর পাঠ, দেশাভিবোধক ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান, কবিতা পাঠ, নাটক, কথিকা ও অত্যন্ত জনপ্রিয় অনুষ্ঠান-‘চরমপত্র’ ও ‘জল্লাদের দরবার’ ইত্যাদি মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করেছে। রণক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের মানসিক ও নৈতিক বল ধরে রাখতে উল্লিখিত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সহায়তা করেছে, সাহস জুগিয়েছে, জনগণকে শত্রুর বিরুদ্ধে দুর্দমনীয় করে তুলেছে।

### স্বাধীনতা অর্জনে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অবদান

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অবদান অপরিসীম। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গ বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। নানা অত্যাচার-নিপীড়ন সহ্য করেছেন। স্বাধীনতা সঞ্চামের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জীবন বাজি রেখে রাজনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে গেছেন।

### বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সঞ্চামের মূল নেতৃত্ব দেন স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর সারাজীবনের কর্মকাণ্ড, আন্দোলন-সংগ্রাম নির্দেশিত হয়েছে বাঙালি জাতির মুক্তির লক্ষ্যে। এই লক্ষ্য নিয়ে তিনি ১৯৪৮ সালে ছাত্রলীগ এবং ১৯৪৯ সালে আওয়ামী সীগ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। ১৯৪৮-১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছিলেন ভাষা আন্দোলনের প্রথম কারাবণ্ডিদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। কী সংসদ, কী রাজপথ, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির পক্ষে তাঁর কর্তৃ ছিল সর্বদা সোচার। ১৯৫৪ সালের যুজ্বলন্ট নির্বাচন, ১৯৫৬ সালের স্থবিধানে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদান, ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে ‘আমাদের বাঁচার দাবি ও দফা’ কর্মসূচি পেশ ও ৬ দফাভিত্তিক আন্দোলন, '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী সীগের নজিরবিহীন বিজয়, ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা ও স্বাধীনতা অর্জনে একচ্ছত্র ভূমিকা পালন করেন স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

পাকিস্তানের চক্রবৃশ বছরের শাসনের মধ্যে ১২ বছর বঙ্গবন্ধুকে কারাগারে কাটাতে হয়েছিল। সঞ্চামের পথ থেরে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি স্বাধীনতার লক্ষ্যে মহান মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিয়েছেন। ২৫শে মার্চ নিরসন্ত্র বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সশস্ত্র আক্রমণে ঝাপিয়ে পড়লে ২৬শে মার্চ ১৯৭১ প্রথম প্রহরে তিনি সরাসরি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁর নামেই আয়াদের মহান মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ও স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি। তাঁর বলিষ্ঠ ও আগোস্থীয় নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলেন জাতির পিতা, স্বাধীনতার মহানায়ক ও স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি।



চিত্র ২.৪ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

### সৈয়দ নজরুল ইসলাম

সৈয়দ নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের চার নেতার একজন। তিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুজিবনগর সরকারের উপ-রাষ্ট্রপতি ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভাস্ত্রপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকে বেগবান ও সফল করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। সৈয়দ নজরুল ইসলাম মুক্তিযুদ্ধের একজন অন্যতম সংগঠক ও পরিচালক ছিলেন।



চিত্র ২.৫ : সৈয়দ নজরুল ইসলাম

### তাজউদ্দীন আহমদ

মুক্তিযুদ্ধের সময় তাজউদ্দীন আহমদ আওয়ামী শীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ সহচর। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য গঠিত মুজিবনগর সরকারের (১০ই এপ্রিল ১৯৭১) প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন এই মহান নেতা। ১৯৭১ সালের ১১ই এপ্রিল তিনি বেতার ভাষণে মুজিবনগর সরকার গঠনের কথা প্রচার করেন। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার তিনি সফল নেতৃত্ব প্রদান করেন। মুক্তিযুদ্ধ চিত্র ২.৬ : তাজউদ্দীন আহমদ



### ক্যাটেন এম. মনসুর আলী

ক্যাটেন এম. মনসুর আলী জাতীয় চার নেতার একজন, যিনি বঙ্গবন্ধুর খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি মুজিবনগর সরকারের অর্ধমন্ত্রী ছিলেন। সে সময়ে খাদ্য, বস্ত্র ও অস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য অর্ধের সংস্থান খুবই গুরুদায়িত্ব ছিল। তিনি সফলভাবে সে দায়িত্ব পালন করেন। চিত্র ২.৭ : ক্যাটেন এম. মনসুর আলী



### এ.এইচ. এম. কামারুজ্জামান

এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান জাতীয় চার নেতার একজন, যিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি মুজিবনগর সরকারের স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী ছিলেন। সে সময়ে তিনি ভারতে আশ্রয় নেওয়া শক্ত শরণার্থীর জন্য ত্রাণ সংহাই ও ত্রাণশিবিরে তা বিতরণ, পরবর্তী সময়ে শরণার্থীদের



চিত্র ২.৮ : এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান

পুনর্বাসন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অত্যন্ত সফলভাবে সঙ্গে পালন করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে তাঁর অবদান অপরিসীম।

### অন্য নেতৃত্বদল

অন্য নেতৃত্বদলের মধ্যে স্বাধীনতা অর্জনে মণ্ডলী আবদুল হায়িদ খান ভাসানীর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা (১৯৬৮-১৯৬৯) থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর ব্যাপারে গড়ে উঠা আল্দেশন ও '৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মুজিবুর্জের সময় ভারতে অবস্থান করে বিভিন্ন দেশের প্রতি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন দান ও পাশে দাঢ়ানোর আহ্বান জানান। এছাড়া অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ (ন্যাপ-মোজাফ্ফর) ও কমিউনিস্ট পার্টির কর্মরেচ মণি সিংও মুজিবুর্জে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মুজিবুর্জ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য গঠিত মুক্তিবনগর সরকারের 'উপদেষ্টা কমিটি'তে এ তিনি নেতৃত্ব সদস্য ছিলেন। বাঙালি জাতি তাদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণে রাখবে।

### মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বজনমত ও বিভিন্ন দেশের ভূমিকা

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নারকীয় ভাঙ্গব বিশ্ব বিবেককে নাড়া দেয়। পাকিস্তানি বাহিনী ও স্বাধীনতাবিরোধী তাদের এদেশীয় দোসরদের দ্বারা সংঘটিত শুটত্রাজ, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ ও হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে বিশ্ব বিবেক জাহাত হয়। বিভিন্ন দেশ নিম্ন ও প্রতিবাদ জানায় এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। ২৫শে মার্চের কালরাত্রি তথা জাতীয় গণহত্যা দিবস এবং পরবর্তী সময়ের নারকীয় হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত সোচার হয়ে উঠে। গোটা বিশ্বের জনগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে সমর্থন জানায়।

**ভারতের ভূমিকা :** বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি সমর্থন জানায় প্রতিবেদী রাষ্ট্র ভারত। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাত্রির বীভৎস হত্যাকাণ্ড ও পরবর্তী নয় মাস ধরে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী বে নারকীয় গণহত্যা, শুটন ও ধ্বনসংজ্ঞ চালায়, ভারত তা বিশ্ববাসীর নিকট সার্ধিকভাবে তুলে ধরে। এর ফলে বিশ্ববিবেক জাহাত হয়।

লাখ লাখ শরণার্থীকে আশ্রয়, মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, অস্ত্র সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সাহায্য করে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে পাকিস্তান ভারতে বিমান হামলা চালায়। ভারত ৬ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী 'যৌথ কমান্ড' গড়ে তোলে। যৌথ বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে ১৩ হাজার পাকিস্তানি সেনাসহ জেলারেল এ কে নিয়াজী নিঃশর্তে যৌথ কমান্ডের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। ভারতের বহু সৈন্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ হারান।

**সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সম্ভাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভূমিকা :** বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের পর সর্বাধিক অবদান রাখে অধুনা বিলুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন, বর্তমান রাশিয়া। পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, নারী-ধর্ষণসহ যাবতীয় মানবতাবিরোধী অপরাধ বজ্ব করার জন্য সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল



চিত্র ২.৯ : পাকিস্তানি বাহিনীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ

ইয়াহিয়া খানকে আহ্বান জানান। তিনি ইয়াহিয়াকে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যও বলেন। সোভিয়েত পত্র-পত্রিকা, প্রচার মাধ্যমগুলো বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নির্বাতনের কাহিনী ও মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি প্রচার করে বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে সহায়তা করে। জাতিসংঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধবন্ধের প্রস্তাব দিয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ‘ভেটো’ (বিরোধিতা করা) প্রদান করে তা বাতিল করে দেয়। কিউবা, যুগোশ্চিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, পূর্ব জার্মানি প্রভৃতি তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন জানায়।

**গ্রেট ভূমিকা :** ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে ভূমিকার প্রচার মাধ্যম বিশেষ করে বিবিসি এবং লন্ডন থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম নির্বাতন এবং বাঙালিদের সংগ্রাম ও প্রতিরোধ, তারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের করুণ অবস্থা, পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা এবং মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি সম্পর্কে বিশ্ব জনমতকে জাগ্রত করে তোলে। ভ্রিটিশ সরকারও আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে খুবই সহানুভূতিশীল ছিল। উদ্বেগ, লজ্জন ছিল বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারের প্রধান ক্ষেত্র। তাছাড়া ভ্রিটিশ নাগরিক বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী জর্জ হ্যারিসন পণ্ডিত রবি শংকর ও আলী আকবর খান মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি ও দানসহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে ‘কনসার্ট ফর বাংলাদেশ’ ৪০,০০০ লোকের সমাগমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডভিত্তিক গান পরিবেশন করেন। ভ্রিটেন ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া, তৎকালীন পঞ্চম জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান ও কানাডার প্রচারমাধ্যমগুলো পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত সৃষ্টিতে সাহায্য করে। ইরাক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন জানায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ, প্রচার মাধ্যম, কংগ্রেসের অনেক সদস্য এদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সোচার ছিল। তবে দৃঢ়খ্যনক হলেও সত্য, বিশ্বের কোনো কোনো দেশ এদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল।

**জাতিসংঘের ভূমিকা :** বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা জাতিসংঘের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা না দিয়ে সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান যখন বাঙালি নিধনে তৎপর, তখন জাতিসংঘ বলতে গেলে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। নারকীয় হত্যাকাণ্ড, মৌলিক মানবাধিকার লজ্জনের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে ‘ভেটো’ ক্ষমতাসম্পন্ন শীচটি খৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রের বাইরে জাতিসংঘের নিজস্ব উদ্যোগে ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা নেই।

### মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক তাত্পর্য

বিশ্বইতিহাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ খুবই তাত্পর্যপূর্ণ ঘটনা। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের প্রথম দেশ, যে দেশ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। ১৯৪৭ সাল থেকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সর্বপ্রকার অত্যাচার, শোষণ, বৈষম্য ও নিপীড়নের শিকার হয়েছে। কিন্তু এ ভূখণ্ডের সংগ্রামী মানুষ এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঝুঁকে দাঁড়ায়। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে এর পরিসমাপ্ত ঘটে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান নেতা বঙবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার যে ডাক দেন এবং ২৬শে মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার যে ঘোষণা প্রদান করেন, ১৬ই ডিসেম্বর তা বাস্তবে পূর্ণতা পায়। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস বাংলাদেশের সাধারণ মানুব মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বপ্রকার সহযোগিতা করে। ফলে মুক্তিযুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় বাঙালির শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী চেতনার বিহিতপ্রকাশ। মুক্তিযুদ্ধ এ অঞ্চলের বাঙালি এবং এ ভূখণ্ডে বসবাসকারী অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর জনগণের মধ্যে নতুন যে দেশপ্রেমের জন্ম দেয়, তা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে যুদ্ধ শেষে জনগণ বিশ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করে।

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, যা বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ হাজার বছরের অপ্র পূরণ হলো। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিশ্বের নিগৰিভূত, স্বাধীনতাকামী জনগণকে অনুপ্রাণিত করে।

### পরিচ্ছেদ ২.২ : স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠনে বঙবন্ধুর শাসন আমল ও পরিবর্তী ঘটনাবলি

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। ২২শে ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার) শাসন কর্মসূল গ্রহণ করে। ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিলের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুযায়ী দেশ পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি স্বাধীনতার মহান স্বপ্নতি জাতির পিতা বঙবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং সরকার প্রথানের দায়িত্বার গ্রহণ করেন। মুক্তিবিপ্লব বাংলাদেশের সামরিক পুনর্গঠন, ভারতে অবস্থানরত এক কোটি শরণার্থীর পুনর্বাসন, সর্বিধান প্রণয়ন, নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠান, ভারতের মিত্রবাহিনীর সদস্যদের ফেরত পাঠানো, বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় ইত্যাদি তীর্ত শাসন আমলের উত্তোলনযোগ্য অর্জন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতাবিলোচ্চী অপূর্ণতার চক্রাতে কতিপয় বিশ্বগামী সামরিক কর্মকর্তার অভূত্যানে বিদেশে অবস্থানরত দুই কল্যা—শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা ব্যক্তিত পরিবারের সকল সদস্যসহ স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্বপ্নতি জাতির পিতা বঙবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নৃশংস হত্যাকাড়ের শিকার হন।

### মুক্তিবিপ্লব দেশ গঠন প্রক্রিয়া

বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয় তখন চারদিকে ছিল স্বজন হারানোর বেদনা, কান্না, হাহাকার আর খৎসন্যজ্ঞ। অসংখ্য রাস্তাধাট, পুল, কলতাট, কলকারখানা, নৌকদর ও সমুদ্ৰবন্দর ছিল বিধৰণ। রাষ্ট্রীয় কোষাগার ছিল অর্ধশূন্য। স্বাধীন বাংলাদেশের ছিল না কোনো সামরিক-বেসামরিক বিমান। ত্রিশ সাথ শহিদের প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশে এক কোটি শরণার্থীর পুনর্বাসন, গ্রাম-গঞ্জের লাখ লাখ ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িয়ের পুনর্নির্মাণ, সর্বোপরি সাড়ে সাত কোটি মানুষের অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বাসস্থানের চাহিদা পূরণ ও আইনশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছিল সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।



চিত্র ২.১০ : দেশ পুনর্গঠনে বঙবন্ধু

মুক্তিবিপ্লব স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠনের দায়িত্ব নিয়েই শুরু হয় বঙবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসন আমল।

যুক্তবিধিস্ত দেশ পুনর্গঠনের মতো কঠিন দায়িত্ব পালন ছাড়াও ১৯৭২-১৯৭৫ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর শাসন আমলের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ নিম্নরূপ :

**নতুন সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকর করা :** ১৯৭২ সালের ১১ই জানুয়ারি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন। ১০ই এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি ‘খসড়া সংবিধান প্রণয়ন’ কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটি ১২ই অক্টোবর খসড়া সংবিধান বিল আকারে গণপরিষদে পেশ করে। ৪ঠা নভেম্বর উক্ত সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত ও ১৬ই ডিসেম্বর থেকে তা বলবত হয়। এই সংবিধানের মূলনীতি হলো— গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ। সংবিধানে সার্বজনীন ভৌটিকার, মৌলিক অধিকার, ন্যায় বিচারসহ জনগণের সকল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার স্বীকৃত হয়।

**গণপরিষদ :** ১৯৭২ সালের ২৩শে মার্চ বঙ্গবন্ধু ‘বাংলাদেশ গণপরিষদ’ নামে একটি আদেশ জারি করেন। এই আদেশবলে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ গণপরিষদের সদস্য বলে পরিগণিত হন। ১৯৭২ সালের ১০ই এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে দেশের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন-কানুন পাস ও কার্যকর করা সম্ভব হয়। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রায় এটি অতীব তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

**পরিত্যক্ত কারখানা জাতীয়করণ :** স্বাধীনতার পর আদমজীসহ বিভিন্ন কলকারখানার পাকিস্তানি অবাঙালি শিল্পপত্রিয়া বাংলাদেশ ত্যাগ করলে বঙ্গবন্ধু সরকার ১৯৭২ সালে সেগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানায় এনে বাংলাদেশের সম্পদে পরিণত করেন। কারখানা জাতীয়করণের ফলে শ্রমিকরা রাষ্ট্রীয় সম্মানজনক অবস্থানে চলে আসেন।

**প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ :** পাকিস্তান আমলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে কর্মরত শিক্ষকগণ সরকারের কাছ থেকে যৎসামান্য বেতন—ভাতা পেতেন। বঙ্গবন্ধু প্রায় ৩৮ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন। এর মাধ্যমে রাষ্ট্র প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

**নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি :** বঙ্গবন্ধু সরকার ১৯৭২ সালে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-এ-খুদাকে প্রধান করে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করে। এই কমিটি ১৯৭৪ সালে একটি গণমুখী বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষানীতির রূপরেখা উপস্থাপন করে। এভাবে বঙ্গবন্ধু সরকার দেশের জন্য একটি যুগেপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গঠনের উদ্দেশ্য গ্রহণ করেছিল।

**রিসিফ প্রদান ও রেশনিং প্রধা :** ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার এবং মানুষজনকে বিদেশ থেকে প্রাপ্ত কম্পল, খাদ্যদ্রব্য ও অর্থ সাহায্য বর্ণন করেন। এছাড়া শহর ও গ্রাম পর্যায়ে ব্যাপকভাবে ন্যায্যমূল্যে খাদ্যদ্রব্যসহ বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী ক্রয় করার জন্যে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করেন। যুক্তবিধিস্ত দেশে সহায়-সম্বলাইন মানুষকে সাহায্যের জন্যে এটা ছিল এক অসাধারণ মানবিক পদক্ষেপ।

**১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচন :** ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ বাংলাদেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে নিরক্ষুশ বিজয় লাভ করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দ্বিতীয় মেয়াদে সরকার গঠিত হয়। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ইতিহাসে এ নির্বাচনের গুরুত্ব অনেক।

**নতুন অর্থনৈতিক পাঁচসালা পরিকল্পনা :** বঙ্গবন্ধুর সরকার দেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করার জন্যে একটি পরিকল্পনা কমিশন গঠন করে এবং প্রণীত হয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। কমিশনের সুপারিশ মোতাবেক বঙ্গবন্ধু যুক্তবিধিস্ত দেশকে নতুনভাবে গড়ে তোলার জন্য ব্যবসায়—বাণিজ্য, শিল্প, কৃষিসহ বিভিন্ন খাতকে ঢেলে সাজানোর উদ্দেশ্য গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সাল পর্যন্ত বকেয়া সুদসহ কৃষি জমির খাজনা মওকফ করে দেওয়া হয়।

**শোবগহীন সমাজ গঠনের লক্ষ্যে ‘ঘূর্ণিয়ে বিপ্লবের’ কর্মসূচি :** মুক্তিযুদ্ধের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে বাংলাদেশ যখন ব্যস্ত, তখন আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্য ও তেলের মূল্যবৃক্ষি পায়। ১৯৭৩-১৯৭৪ সালে বন্যায় দেশে খাদ্যোৎপাদন দারুণভাবে ব্যাহত হয়। এসবের ফলে দেশে খাদ্য সংকট সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি দেশের অভ্যন্তরে মজুদদার, প্রদুর্নীতিবাজ এবং ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠী তৎপর হতে থাকে। বঙ্গবন্ধুর সরকার জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি ১

এবং শোষণহীন সমাজ গঠনের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি সহ বিভিন্ন দল নিয়ে বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠন করে। গণমানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু নতুন একটি ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেন। এটিকে জাতির পিতা ‘হিতীয় বিপ্লব’ বলে অভিহিত করেন।

**পররাষ্ট্রনীতি :** পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি ঢাকায় পদার্পণ করে বঙ্গবন্ধু বলেন, ‘বাংলাদেশ শাস্তিতে বিশ্বাস করে, কারও প্রতি বৈরী আচরণ সমর্থন করবে না।’ তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন, ‘সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শক্তি নয়’-এ নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারিত হবে। তিনি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান এবং পুনর্গঠনে সহযোগিতা প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অনুরোধ করেন। ফলে স্বল্প সময়ের মধ্যে ১৪০টি দেশ বাংলাদেশকে স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন চট্টগ্রাম বন্দরকে মাইনমুক্ত করাসহ নানাভাবে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ করে। অন্যান্য বন্ধুভাবাপন্ন দেশ ও খাদ্যব্য ও ত্রাণসামগ্রী নিয়ে এগিয়ে আসতে থাকে।

**ভারতীয় মিত্রবাহিনীর ফেরত যাওয়া :** বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সেনাবাহিনী মিত্রবাহিনী হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিল। পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজিত করার ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান অবিস্মরণীয়। ভারতীয় বাহিনীর উপর্যুক্তি নিয়ে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন মহলকে অপপ্রচারের সুযোগ না দিয়ে বঙ্গবন্ধু ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সরকারকে মিত্রবাহিনীর সদস্যদের ফিরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ করেন। ১৯৭২ সালের মার্চ মাসেই মিত্রবাহিনী বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে ফিরে যায়। বিশ্ব ইতিহাসে বিদেশি সৈন্যদের এত স্মৃত স্বদেশে ফিরে যাবার নজির বিরল। এতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়।

**আন্তর্জাতিক বিশ্বে বাংলাদেশ :** ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ব্রিটিশ কমনওয়েলথের এবং ১৯৭৪ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলায় প্রথম ভাষণ প্রদান করেন। এছাড়া বাংলাদেশ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের এবং ওআইসি এর সদস্যপদ লাভ করে। বিশ্বশান্তি পরিষদ বঙ্গবন্ধুকে ‘জুলিও কুরি’ শান্তি পদকে ভূষিত করে। বঙ্গবন্ধুর সময়ে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সম্মানের মর্যাদা লাভ করে। যুক্তিবিধবস্ত একটি সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের হাল ধরতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারকে দেশি-বিদেশি নানা ষড়যন্ত্র ও প্রাকৃতিক দুর্ঘোগ মোকাবিলা করতে হয়। এর মধ্যেও স্বল্প সময়ে সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়।

## ১৯৭২ সালের সর্থবিধান প্রণয়ন পর্টভূমি

সর্থবিধান হচ্ছে একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দলিল। সর্থবিধানের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও লক্ষ্য প্রতিফলিত হয়। ১৯৭২ সালের ১১ই জানুয়ারি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অস্থায়ী সর্থবিধান আদেশ জারি করেন। এতে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। অস্থায়ী সর্থবিধান আদেশের বিভিন্ন দিক হলো: এই আদেশ বাংলাদেশের অস্থায়ী সর্থবিধান আদেশ। এটি অবিলম্বে বলবৎ হবে। এটি সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হবে। বাংলাদেশের জন্য একটি সর্থবিধান রচনার উদ্দেশ্য একটি গণপরিষদ গঠিত হবে। দেশে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার থাকবে। প্রধানমন্ত্রী হবেন সরকারপ্রধান। রাষ্ট্রপতি হবেন রাষ্ট্রপ্রধান।

কাজ
দলিলত : অস্থায়ী সর্থবিধান আদেশের বিভিন্ন দিক ও এর উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।

একটি সর্থবিধান প্রণয়ন করে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২৩শে মার্চ ‘বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ’ নামে একটি আদেশ জারি করেন। এ আদেশ অনুসারে ১৯৭০ সালের

নির্বাচনে প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত সদস্যগণ গণপরিষদের সদস্য হবেন। সংবিধান প্রণয়ন করাই হবে গণপরিষদের মূল লক্ষ্য। ১৯৭২ সালের ১০ই এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে ড. কামাল হোসেনের মেত্তে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি ‘খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি’ গঠন করা হয়। একজন নারী সদস্য এ কমিটিতে অঙ্গুষ্ঠুক্ত হন। ন্যাপ (মোজাফফর)-এর সুরক্ষিত সেনগৃহ (পরবর্তী সময় আওয়ামী লীগ নেতা) সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য ছিলেন। খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি দেশের বিভিন্ন সংগঠন ও আগ্রহী ব্যক্তিগণের কাছ থেকে সংবিধান সম্পর্কে প্রস্তাব আহ্বান করে।

১৯৭২ সালের ১২ই অক্টোবর গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে খসড়া সংবিধান বিল আকারে পেশ করা হয়। ৪ঠা নভেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয় এবং ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস থেকে তা কার্যকর হয়। গণপরিষদে সংবিধানের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, “এই সংবিধান শহিদের রক্তে লিখিত, এ সংবিধান সমগ্র জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্তি প্রতীক হয়ে বৈঁচে থাকবে।” এখানে উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানে সংবিধান প্রণয়ন করতে সময় লেগেছিল প্রায় নয় বছর (১৯৪৭-১৯৫৬) আর ভারতের লেগেছিল প্রায় তিন বছর (১৯৪৭-১৯৪৯)। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সরকার মাত্র দশ মাসে বাংলাদেশকে একটি সংবিধান উপহার দিতে সক্ষম হয়। গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় জাতির জনকের এটা এক অসাধারণ অবদান।

## ১৯৭২ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

১৯৭২ সালের মূল সংবিধানটি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে মহিমাম্বিত। এ সংবিধানের বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ :

১৯৭২ সালের সংবিধান একটি লিখিত সংবিধান। সংবিধানটি দুর্ঘরিবর্তনীয়। এ-সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার চারটি মূলনীতি—জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এগুলোকে রাষ্ট্রের মূল স্তুতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। মানুষের মৌলিক প্রয়োজন, যেমন-অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি মেটানোর দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর অর্পিত হয়। সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ এ সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। জীবন ধারণের অধিকার, চলাফেরার অধিকার, বাক-স্বাধীনতার অধিকার, চিকিৎসা ও বিবেকের স্বাধীনতা, ধর্মচর্চার অধিকার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি তোগের অধিকার ইত্যাদি সংবিধানে সন্তুষ্টিপূর্ণভাবে রয়েছে। সংবিধানে বাংলাদেশকে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। জাতীয় সংসদ সার্বভৌম আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। এ সংবিধানে বাংলাদেশকে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়, যা ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ’ নামে পরিচিত। ‘প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ’—সংবিধানের এ ঘোষণা দ্বারা জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। [সূত্র: সংবিধানের প্রাধান্য ৭ (১)] সংবিধানকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইনের মর্যাদা প্রদান করা হয়। সংবিধান পরিপন্থী কোনো আইনকে অসাধিকারিক বলে সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে সংবিধানের মর্যাদা ও প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে। এ সংবিধানে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের ৭৭ নং অনুচ্ছেদে ‘ন্যায়পাল’ পদ সূচিতে কথা উল্লেখ রয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ১৮ বছর বয়স্ক যে কোনো নাগরিক ‘এক ব্যক্তি এক ভোট’—এ নীতির ভিত্তিতে সর্বজনীন ভোটাধিকার মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। এ সংবিধানে রাষ্ট্রীয়, সমবায় এবং ব্যক্তিগত মালিকানা নীতি স্বীকৃত। বাংলাদেশের আইনসভা এক কক্ষ বিশিষ্ট হবে। ১৯৭২ সালের সংবিধান বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকার এ পর্যন্ত ঘোলবার সংশোধন করেছে। তন্মধ্যে জেনারেল জিয়াউর রহমানের পক্ষে সংশোধনী এবং জেনারেল এরশাদের সপ্তম সংশোধনী ও অয়োদশ সংশোধনী সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে দিয়েছে।

## ১৫ই আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ড

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বাঞ্ছিলির জাতীয় জীবনে ঘটে এক নির্মম, নিষ্ঠুর পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড। সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্চাভিলাষী ও উচ্চজ্ঞল সেনাসদস্য স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তির মদে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা স্বাধীনতার

মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কের, বাড়ি নম্বর-৬৭৭ নিজ বাসভবনে নৃশংসভাবে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধু পরিবারের উপস্থিত কোনো সদস্যই ঘাতকদের হাত থেকে রক্ষা পাননি। এমনকি ঘাতকের নিষ্ঠুর বুলেটের হাত থেকে রক্ষা পায়নি ১০ বছরের নিষ্পাপ শিশু রাসেলও। একটি আধুনিক ও শোষণ-দুর্বিত্তিমুক্ত রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে ‘দ্বিতীয় বিপ্লবের’ কর্মসূচি নিয়ে বঙ্গবন্ধু যখন সমগ্র জাতিকে ঐক্যবন্ধ করে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিলেন, ঠিক তখন দেশি-বিদেশি প্রতিক্রিয়াশীল অপশঙ্কা মহলের সহযোগিতায় দেশের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা বড়ব্যক্তিগতি গোষ্ঠী ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে। তারা বুর্ঝতে পেরেছিল যে, বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের মতো ‘দ্বিতীয় বিপ্লবের’ কর্মসূচি বাস্তবায়নেও সফল হবেন। তাই বাংলাদেশের রাজনৈতিক গতিপথকে উল্লেখ দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যেই ১৫ই আগস্টের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছিল। এ হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে দেশে পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠা পায়। এই হত্যাকাণ্ড ছিল একটি নৃশংস ও মানবতাবিরোধী অপরাধ। এটি ঘটেছিল গোপন বড়ব্যক্তের মাধ্যমে। এ হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশ গভীর রাজনৈতিক সংকটে পড়ে। ১৫ই আগস্ট আমাদের জাতীয় শোক দিবস।

কাজ

দলগত : (ক) ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের নির্মাতাকে উপস্থাপন কর।  
 (খ) জাতির পিতাকে হত্যার উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।

### বাংলাদেশের ইতিহাসে ক্রতিপ্য কলঙ্কময় অধ্যায় (১৫ই আগস্ট-৩রা নভেম্বর ১৯৭৫)

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ রাষ্ট্রপতির পদে আসীন হয়ে সামরিক শাসন জারি করে এবং ২২শে আগস্ট মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বান্বকারী জাতীয় চার নেতাকে গ্রেফতার করে। ২৪শে আগস্ট জেনারেল কে. এম. সফিউল্লাহকে সরিয়ে জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ নিযুক্ত করা হয়। ৩১শে আগস্ট এক অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ১৫ই আগস্টের হত্যাকারীদের বিচারের হাত থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য ১৯৭৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর খন্দকার মোশতাক ‘ইনডেমনিটি অর্ডিনেস’ নামে সংবিধান ও আইনের শাসনবিরোধী একটি অধ্যাদেশ জারি করে। ১৫ই আগস্টের হত্যার সঙ্গে জড়িত জুনিয়র সেনা অফিসাররা ব্যারাকে ফিরে না গিয়ে বঙ্গভবনে বসে দেশ পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করতে থাকে। এতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বিপ্লেডিয়ার খালেদ মোশাররফ সেনাবাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলা (চেইন অব কমাও) ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হন। ৩রা নভেম্বর তাঁর নেতৃত্বে এক সেনা অভ্যর্থন সংঘটিত হয়। ৫ই নভেম্বর খন্দকার মোশতাক পদত্যাগের ঘোষণা দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ৬ই নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এ.এস.এম. সায়েম নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

### জেলখানায় পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড (৩রা নভেম্বর ১৯৭৫)

১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর গভীর রাতে ১৫ই আগস্ট হত্যাকাণ্ডের খুনিচক্র সেনাসদস্যরা দেশত্যাগের পূর্বে খন্দকার মোশতাকের অনুমতি নিয়ে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে বেআইনিভাবে প্রবেশ করে সেখানে বল্দি অবস্থায় থাকা মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বান্বকারী জাতীয় চার নেতা—সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাট্টেন এম. মনসুর আলী ও এ. এইচ. এম. কামালুজ্জামানকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। শুরু হয় বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে আর একটি কলঙ্কময় অধ্যায়ের। এ পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড দেশের জনগণ এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এ ঘটনা মোশতাকের পতন দ্বারা স্থিত করে। খুনিরা দেশত্যাগে বাধ্য হয়। এ হত্যাকাণ্ড ছিল ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত, স্বাধীনতাবিরোধী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর সম্মিলিত বড়ব্যক্ত ও নীলনজরীর বাস্তবায়ন। ১৫ই আগস্ট ও ৩রা নভেম্বরের হত্যাকাণ্ড একই গোষ্ঠী সংঘটিত করে। উভয় হত্যাকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের অর্জনসমূহ ধ্বংস ও দেশকে নেতৃত্বশূন্য করে পাকিস্তানি ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠা করা।

কাজ

একক : ৩ নভেম্বর জেল হত্যার উদ্দেশ্যগুলো চিহ্নিত কর।

## পরিচ্ছেদ ২.৩ : সেনা শাসন আমল (১৯৭৫-১৯৯০)

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পর থেকে ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে অবৈধ সেনা শাসন বহাল ছিল। দেশের সংবিধানকে উপেক্ষা করে খন্দকার মোশতাক, বিচারপতি সায়েম, জিয়াউর রহমান, বিচারপতি আহসান উদ্দিন এবং জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। দেশে সেনা শাসন বহাল রেখে সুবিধামতো সময়ে জিয়াউর রহমান (১৯৭৫-১৯৮১) এবং জেনারেল এরশাদ (১৯৮২-১৯৯০) নির্বাচন সম্মত করে বেসামরিক শাসন চালু করেন। তাদের অগণতাত্ত্বিক শাসন, জনগণের ভোটাধিকার হরণ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিবোধী কার্যকলাপ দেশের জনগণকে বিক্ষুক করে তোলে। ফলে সেনা শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ আল্দেলন-সংগ্রামের পর অবশেষে ১৯৯১ সালে পুনরায় গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়।

### জিয়াউর রহমানের শাসন আমল (১৯৭৫-১৯৮১)

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় জিয়াউর রহমান সামরিক বাহিনীর মেজর ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ২৬শে মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা তিনি ২৭শে মার্চ কালুরঘাট বেতার ক্ষেত্র থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর পক্ষে পাঠ করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর সরকারের অধীনে তিনি ২ নম্বর সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু পরিবার পরিজনসহ শাহাদাত বরণ করার পর খন্দকার মোশতাক সংবিধান লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করেন। এরপর ২৪শে আগস্ট তিনি সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ পদে জিয়াউর রহমানকে নিযুক্ত করেন। ৩ রাত নভেম্বরের সেনা অভ্যর্থনানে খন্দকার মোশতাকের পতন ঘটে এবং জিয়াউর রহমান গৃহবন্দি হন। ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর পাল্টা সেনা অভ্যর্থনের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় জাতীয় শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধা সেনা সদস্যদের হত্যার ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এর আগে ৬ই নভেম্বর ভোরোতে গৃহবন্দি জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করতে যায় বঙ্গবন্ধুর খুনি ফারুকের ল্যাঙ্গার বাহিনীর একটি দল। জিয়াউর রহমান মুক্ত পেয়ে সদ্য নিযুক্ত রাষ্ট্রপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমের অনুমতি ব্যতিরেকে বেতারে ভাষণ দিতে চলে যান এবং নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে দাবি করেন। পরে অবশ্য পদবি পরিবর্তন করে উপ-প্রধান আইন প্রশাসক হয়েছিলেন। ১৯৭৭ সালে প্রহসনমূলক গণভোটের (হ্যাঁ ভোট ও না ভোট) মধ্য দিয়ে নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলেও তার শাসন আমলে ২০টির ও বেশি সেনা অভ্যর্থন ঘটেছিল এবং সেনা বাহিনীতে চরম বিশ্বাস্তা দেখা দিয়েছিল। এসকল ব্যর্থ সেনা অভ্যর্থনের পর জিয়াউর রহমান বিচারের নামে অনেক নিরপরাধ সামরিক কর্মকর্তা ও সেনা সদস্যদের সাজা, চাকরিচ্যুত এমনকি মৃত্যুদণ্ড দেয়। জিয়াউর রহমানের শাসন আমলে বাংলাদেশের রাজনীতি ও পরাণ্ত্রনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং ১৯৭২-এর সংবিধানের যেসব মৌলিক নীতি ও চেতনার ভিত্তিতে বাংলাদেশ পরিচালিত হয়ে আসছিল, তার বেশিরভাগই এ সময়ে বাতিল করে দেওয়া হয়। স্বাধীনতাবিবোধী পাকিস্তানপত্রি প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিবর্গকে তিনি সমাজ ও রাজনীতিতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। ৭ই নভেম্বর জিয়াউর রহমানকে বন্দি অবস্থা থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি মুখ্য ভূমিকা পালন করেন সেই বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সেক্টর কমান্ডার কর্নেল (অব.) আবু তাহেরকে ১৯৭৬ সালে সামরিক আদালতে প্রহসনের বিচার শেষে তারই আদেশে ফাঁসি দেওয়া হয়। ১৫ই আগস্টসহ বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের বিচার করা যাবে না মর্মে যে কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ প্রণীত হয়েছিল তার মূল হোতাও ছিলেন জিয়াউর রহমান।

### নির্বাচন ও দল গঠন

১৯৭৬ সালে কিছু শর্ত সাপেক্ষে রাজনৈতিক দলগুলোকে ‘ঘরোয়া রাজনীতি’ করার অনুমতি দেওয়া হয়। ১৯৭৭ সালের ৩০শে মে জিয়াউর রহমান তার ক্ষমতা বৈধকরণের লক্ষ্যে হ্যাঁ / না ভোটের আয়োজন করেন। এরপর তিনি নিজস্ব পরিকল্পনা মতো বিভিন্ন দল থেকে নেতাকর্মীদের নিয়ে জাতীয়তাবাদী গণতাত্ত্বিক দল (জাগদল) গঠন করেন।

এ সময়ে রাজনৈতিক দল ভাঙা-গড়ার কাজও চলে। পরিশেষে চাপের মধ্যে ১৯৭৮ সালের ৩ রাত জুন দেশে প্রহসনমূলক রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন উপলক্ষে দুটি জোট গঠিত হয়। একটি ছিল জিয়া প্রতিষ্ঠিত ‘জাগদল’-এর নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট আর অপরটি হলো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ‘গণতান্ত্রিক ঐক্য জোট’। জিয়া ছিলেন জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের প্রার্থী। মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি এম.এ.জি ওসমানী ছিলেন গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটের প্রার্থী। কারচুপির এ নির্বাচনে জিয়াউর রহমান সহজে বিজয় অর্জন করেন। সামরিক শাসনাধীনে অনুষ্ঠিত এসব নির্বাচনে প্রধানত শাসকের ইচ্ছারই বাস্তবায়ন ঘটে। ১৯৭৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জিয়াউর রহমান ইতোপূর্বে গঠিত জাগদল বিলুপ্ত ঘোষণা করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গঠন করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ২০৭টি আসন পেয়ে বিএনপি জয়লাভ করে। উক্ত সংসদে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের

## কাজ

দলগত: জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসন বৈধকরণের পদক্ষেপগুলো কী ছিল, তার তালিকা তৈরি কর।

৬ই এপ্রিল পর্যন্ত যে সকল সামরিক বিধি, সংবিধান সংশোধনসহ বিভিন্ন অধ্যাদেশ জারি করা হয়, সেগুলো সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী হিসেবে পাস করা হয়। অবশ্য সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীকে দেশের সর্বোচ্চ আদালত ২০০৮ সালে এক রায়ে অবৈধ হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৭৯ সালের ৬ই এপ্রিল অনুষ্ঠিত সংসদ অধিবেশনে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করা হয়। বেসামরিকীকরণ পক্ষিয়া চালু করে রাজনীতিতে জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধ বিরোধিতাকারীদের পুনর্বাসন করেন। তিনি সংবিধানের মূলনীতি পরিবর্তন করেন। রাজনীতিতে ধর্মের অপব্যবহারের পথ তৈরি করেন। জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের নিজস্ব ব্যাখ্যা প্রদান করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী চীন ও সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কিছু দেশ বাংলাদেশকে এই সময়ে স্বীকৃতি প্রদান করে। পাকিস্তান বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক শীতল হয়ে পড়ে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হয়। ধর্মকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার লক্ষ্যে এ সময় বাংলাদেশ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের নীতি অনুসরণ করে। জিয়াউর রহমান দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা সংথা (সার্ক) গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

১৯৮১ সালের ৩০শে মে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান একদল সামরিক কর্মকর্তার হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। ফলে জিয়াউর রহমানের সাড়ে পাঁচ বছরের সেনা শাসনের অবসান ঘটে।

### জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শাসন আমল (১৯৮২-১৯৯০)

১৯৮১ সালের ৩০শে মে জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর সংবিধান অনুযায়ী উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ ছিলেন জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। ১৯৮১ সালের ১৫ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিচারপতি আবদুস সাত্তার জয়লাভ করেন। কিন্তু

## কাজ

দলগত: জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ কীভাবে ক্ষমতায় আসেন তা চিহ্নিত কর।

বিচারপতি সাত্তারের দুর্বল নেতৃত্ব, রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্নীতি, দলীয় কোন্দল, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও অর্থনৈতিক সংকটের কারণ দেখিয়ে ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সামরিক আইন জারি করে রাজপ্রাতিহাইন এক অভ্যর্থনের মাধ্যমে সাত্তার সরকারকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করেন। ক্ষমতায় এসেই তিনি সংবিধান স্থগিত করেন এবং জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেন। সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আহসান উদ্দিনকে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করা হয়। সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন। ১৯৮৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি আহসান উদ্দিনকে অপসারণ করে জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ নিজেই রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হন।

১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ সামরিক শাসন জারির পর দেশে রাজনৈতিক কার্যক্রম নিযিন্দ্র করা হয়। পত্র-পত্রিকা স্বাধীনভাবে

স্থান পরিবেশন করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। শেখ হাসিনা, ড. কামাল হোসেন, মোহাম্মদ ফরহাদসহ বেশ কয়েকজন নেতাকে প্রেরিত বা অন্তরীণ করা হয়। ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, জাসদ ছাত্রলীগসহ কয়েকটি ছাত্র সংগঠন ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম বিক্ষেপ করে। শুরু হয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন। এ আন্দোলনে পুলিশি হামলায় ও সরকার সমর্থক সজ্ঞাসীদের কর্মকাণ্ডে সেলিম, দেলোয়ার, শাহজাহান সিরাজ, জয়নাল, দিপালি সাহা ও রাউফুন বসুনিয়াসহ বেশ কয়েকজন ছাত্র নিহত হন। এরপর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৫ দলীয় এবং বিএনপির নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোটগঠিত হয়। এ জোটসমূহের আন্দোলনই ১৯৯০-এ এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনে পরিণত হয়। অবশেষে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদ পদত্যাগে বাধ্য হন। জেনারেল এরশাদ সরকার পূর্ববর্তী জিয়াউর রহমান সরকারের অধিকাংশ নীতি অনুসরণ করে।

## দল গঠন ও নির্বাচন

জেনারেল হসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতা প্রাপ্তের শুরু থেকেই ব্যাপক রাজনৈতিক বিরোধিতার মুখে পড়েন। ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন ও রাজনৈতিক দলসমূহের দাবির মুখে দ্রুত রাজনৈতিক কার্যক্রম শুরু করতে বাধ্য হন। ১৯৮৩ সালের ১ লা এপ্রিল ঘৰোয়া রাজনীতি এবং ১৪ই নভেম্বর প্রকাশ্য রাজনীতির অনুমতি প্রদান করেন। ১৯৮৩ সালের ১৭ই মার্চ ১৮ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে এরশাদ নিজেই জনদল নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৮৩ সালে দেশে ইউনিয়ন পরিষদ এবং ১৯৮৪ সালে পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৫ সালের ২১শে মার্চ এরশাদ লোক দেখানো প্রহসনমূলক গণভোটের আয়োজন করেন। এ গণভোটে জনগন ‘হ্যাঁ’/‘না’র মাধ্যমে মতামত ব্যক্ত করে।

জেনারেল হসেইন মুহম্মদ এরশাদ প্রাশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে উপজেলা পদ্ধতি চালু করেন। ১৯৮৫ সালের ১৬ ও ২০শে মে নতুন প্রবর্তিত উপজেলা পরিষদের নির্বাচন রাজনৈতিক দলগুলোর বিরোধিতা সত্ত্বেও অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৫ সালের ১৬ই আগস্ট জনদলসহ ৫টি ছোট দল নিয়ে জাতীয় ফ্র্স্ট গঠিত হয়। এই ফ্র্স্টই ১৯৮৬ সালের ১লা জানুয়ারি জাতীয় পার্টি নামে আত্মপ্রকাশ করে। জেনারেল হসেইন মুহম্মদ এরশাদ সামরিক বাহিনী থেকে অবসর নিয়ে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান পদ গ্রহণ করেন।

১৯৮৬ সালের ৭ই মে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে জেনারেল হসেইন মুহম্মদ এরশাদের জাতীয় পার্টি, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ৮ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামীসহ মোট ২৮টি দল অংশগ্রহণ করে। বিএনপির নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট নির্বাচন বর্জন করে। নির্বাচনে জাতীয় পার্টি মোট ৩০০ আসনের মধ্যে ১৫৩টি আসন পেয়ে জয়লাভ করে। আওয়ামী লীগ এককভাবে ৭৬টি আসন লাভ করে হিতীয় বৃহস্পতি দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য দল জেনারেল হসেইন মুহম্মদ এরশাদের বিরুদ্ধে মিডিয়া ক্যু র মাধ্যমে বিজয় ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠাপন করে। পর্যবেক্ষকগণও অভিযোগের যথার্থতাকে সমর্থন করেন। ১৯৮৬ সালের ১৫ই অক্টোবর রাস্তপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বিরোধী দলগুলো নির্বাচন বয়ক্ট করে। প্রহসনমূলক এ নির্বাচনে জেনারেল হসেইন মুহম্মদ এরশাদকে রাস্তপতি ঘোষণা করা হয়।

১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং রাস্তপতি নির্বাচনের পর থেকেই এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে সকল রাজনৈতিক দল, সাধারণ জনগণ এবং নাগরিক সমাজ বিক্ষেপে ফেটে পড়ে। জেনারেল এরশাদের পদত্যাগ ও একটি অর্ধেক নির্বাচনের দাবিতে বিরোধী দল গণআন্দোলন শুরু করে। ১৯৮৭ সালে সংসদ থেকে একযোগে বিরোধী দল পদত্যাগ করলে ডিসেম্বরে জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেওয়া হয়। ১৯৮৮ সালের ঢৱা মার্চ চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করা হয়। আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ দেশের প্রধান দলগুলো নির্বাচন বর্জন করে। ভোটারবিহীন, দলবিহীন এ নির্বাচনে জাতীয় পার্টিকে ২৫১টি আসনে বিজয়ী দেখানো হয়। সরকার অনুগত আ.স.ম. রবের নেতৃত্বাধীন সঞ্চালিত বিরোধী জোটকে ১৯টি আসন দেওয়া হয়। বাকি আসনের ৩টি জাসদ (সিরাজ), ২টি ফ্রিডম পার্টি এবং ২৫টি ঘৰোয়া প্রার্থীদের মাঝে ব্যক্ত করা হয়।

জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের ৯ বছরের দীর্ঘ শাসনকালে রাস্তাঘাট নির্মাণসহ দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়।

### পরিচ্ছেদ ২.৪ : গণতন্ত্রের পুনর্যাত্ত্বা

স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচর্চের হাতে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বরগের পর বাংলাদেশের গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা মারাত্তকভাবে ব্যাহত হয়। দেশে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সামরিক, বেসামরিক আদলে সেনা শাসন অব্যাহত ছিল।

১৯৯০ সালে ৬ই ডিসেম্বর জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের পদত্যাগের মধ্য দিয়ে সামরিক শাসনের অবসান ঘটে; গণতন্ত্রের পুনর্যাত্ত্বা শুরু হয়। সকল দলের অংশগ্রহণে ১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তনের গণতান্ত্রিক ধারা চালু হয়। সামরিক সরকারসমূহের দৃঢ়শাসনের কবল থেকে মুক্ত হয়ে জনগণ দেশে একটি স্থায়ী গণতান্ত্রিক ধারা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অগ্রসর হয়। এ অগ্রযাত্রায় সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ এক বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখে। একটি প্রকৃত জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষ জেল-জুলুম-নির্যাতন এমনকি মৃত্যুকে তুছজ্জান করে অকাতরে প্রাণ দেয়। জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি কর্তৃক শাসনব্যবস্থা পরিচালনার পথ উন্নত হয়। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার থেকে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি দেশে পুনঃপ্রবর্তন ও সংবিধানে তা অঙ্গুত্ত হয়।

### ১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থান ও গণতন্ত্রের পুনর্যাত্ত্বা

১৯৮২ সালের শেষ দিকে জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায় ছাত্র সমাজ। ১৯৭২ সালের মূল সংবিধান অক্ষণ্ণ রেখে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৫ দলীয় ঐক্যজ্ঞাট এবং বিএনপির নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট গঠিত হয়। ১৫ দল ও ৭ দল সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনকে সফল করার লক্ষ্যে ৫ দফা দাবি ঘোষণা করে। ৫ দফা কর্মসূচির মূল দাবি ছিল অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার, সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া এবং যে কোনো নির্বাচনের আগে সার্বভৌম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান।

সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বেসামরিক সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল বাংলাদেশের জনগণ ভালো চোখে দেখেন। ফলে জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ দীর্ঘ প্রায় নয় বছরের শাসনকালে প্রবল গণআন্দোলনের সম্মুখীন হন। এ আন্দোলনে রাজনৈতিক দল ছাড়াও ছাত্র, শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, সাংবাদিক, কৃষিবিদ, কৃষক-শ্রমিকসহ সকল শ্রেণি ও পেশার জনগণ অংশ গ্রহণ করে। তাই এ আন্দোলন গণআন্দোলন থেকে ক্রমান্বয়ে গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। উল্লিখিত ১৫ দল, ৭ দল, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদসহ বিভিন্ন জোটের আন্দোলনের চাপে জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনের অনুমতি দেন।

১৯৮৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন, প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং ১৯৮৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের অভিজ্ঞতা থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর বক্ষমূল ধারণা জন্মে যে, জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শাসন আমলে কোনো সূর্ঘ্য ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়। তাই ১৯৮৭ সালে ৮ দল, ৭ দল ও ৫ দল জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে একমত পোষণ করে এবং সকল জোট ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু করে। তিন জোটের হরতাল

কাজ
দলগত : ১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থানে জোটের রাজনীতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

এবং ‘ঢাকা অবরোধ’ কর্মসূচির ফলে এরশাদবিরোধী আন্দোলন তৈরি হেকে তৈরিতর হতে থাকে। আন্দোলনের একপর্যায়ে ১৯৮৭ সালের ১০ই নভেম্বর নূর হোসেন বুকে ও পিঠে ‘গণতন্ত্র মুক্তি পাক, সৈরাচার নিপাত যাক’ জ্বেল গিখে ঢাকার জিপিও (জেনারেল পোল্ট অফিস)-এর নিকট জিরো পয়েন্টে পুলিশের গুলিতে নিহত হন। এতে আন্দোলনকারী জনগণ স্মৃত হয়। ১৯৮৭ সালের ১২ই নভেম্বর শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে প্রেরণ করা হয়। ২৭শে নভেম্বর এরশাদ সরকার দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। ১৯৮৮ সালের ২৪শে জানুয়ারি ঢেক্টোরে শেখ হাসিনার এক সমাবেশে সরকারের মদদপুষ্ট সজ্ঞাসীরা নির্বিচারে জনতার উপর গুলি চালায়। অল্পের জন্য শেখ হাসিনা প্রাণে রক্ষা পান। এর বিরুদ্ধে সমগ্র দেশ প্রতিবাদমূখ্য হয়ে ওঠে। ১৯৯০ সালের ১০ই অক্টোবর বিরোধী জ্বেট ও দলগুলোর সচিবালয় দেরাও কর্মসূচি রাজনৈতিক অঙ্গনকে উত্পন্ন করে তোলে। এই দিন মিহিলে গুলিবর্ষণে ৫ জন নিহত এবং তিনি শতাধিক আহত হয়। ১০ই অক্টোবর ২২টি ছাত্র সংগঠন ‘সর্বদলীয় ছাত্র এক্য’ গঠন করে এবং এরশাদের পতন না হওয়া পর্যন্ত এক্যবদ্ধ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়। বিরোধী দলের একের পর এক আন্দোলন ও কর্মসূচির কারণে জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ পিছু হটতে থাকেন। আন্দোলন থামানোর জন্য বিভিন্ন কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেও এরশাদ সরকার আবার তা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। তিনি জ্বেট কর্তৃক জেনারেল এরশাদ ও তার সরকারের পদত্যাগ এবং নিন্দায় নিরপেক্ষ ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কর্মূলসহ একটি যৌথ ঘোষণা জাতির সমক্ষে উপস্থাপন করা হয়, যা ‘তিনি জ্বেটের বৃপ্রেরোধ’ নামে খ্যাত।

২৭শে নভেম্বর বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন (বিএমএ) নেতা ডা. সামসুল আলম মিলনের গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ এরশাদবিরোধী আন্দোলনকে চৰম ঝুঁপ দেয়। ২৯শে নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককূল একযোগে পদত্যাগ করেন। পাশাপাশি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককূলও পদত্যাগের ঘোষণা দেন। সংগঠিত হয় এরশাদবিরোধী ৯০-এর গণঅভ্যাস। এ সময়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জ্বেট, বিএনপির নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জ্বেট এবং ৫ দলীয় বাম জ্বেট একটি অভিন্ন কর্মসূচিতে এক্যবদ্ধ হলে ১৯৯০-এর ৪ঠা ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দেন। ৬ই ডিসেম্বর তিনি জ্বেটের বৃপ্রেরোধ অনুযায়ী সুন্দীর কোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুল্লৈন আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত অভর্তাকালীন সরকারের হাতে জেনারেল এরশাদ আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। নতুন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুল্লৈন আহমেদ গণতন্ত্রের অভিযানায় জাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৯০ সালের গণঅভ্যাসের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে সামরিক শাসনের অবসান ঘটে এবং গণতন্ত্রের পুনর্বাচা শুরু হয়। সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে ১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি ৫মে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তনের গণতান্ত্রিক ধারা চালু হয়। সংসদীয় সরকার পদবৃত্তি সংরিখানে অন্তর্ভুক্ত হয়। দেশে অবাধ তথ্যবিহীন সূচি, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, পত্র-পত্রিকার উপর থেকে বিধিনিয়েধ প্রত্যাহার ইত্যাদির ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে পৃথিবীতে পরিচিতি পায়।

### কাজ

দলগত : জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদবিরোধী আন্দোলনের বিভিন্ন জ্বেটগুলোর নাম উল্লেখ করে তাদের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।



চিত্র ২.১২ : গণ অভ্যাসে নূর হোসেন

আলম মিলনের গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ এরশাদবিরোধী আন্দোলনকে চৰম ঝুঁপ দেয়। ২৯শে নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককূল একযোগে পদত্যাগ করেন। পাশাপাশি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককূলও পদত্যাগের ঘোষণা দেন। সংগঠিত হয় এরশাদবিরোধী ৯০-এর গণঅভ্যাস। এ সময়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জ্বেট, বিএনপির নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জ্বেট এবং ৫ দলীয় বাম জ্বেট একটি অভিন্ন কর্মসূচিতে এক্যবদ্ধ হলে ১৯৯০-এর ৪ঠা ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দেন। ৬ই ডিসেম্বর তিনি জ্বেটের বৃপ্রেরোধ অনুযায়ী সুন্দীর কোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুল্লৈন আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত অভর্তাকালীন সরকারের হাতে জেনারেল এরশাদ আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। নতুন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুল্লৈন আহমেদ গণতন্ত্রের অভিযানায় জাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিএনপি ১৪০টি আসন লাভ করে। কিন্তু সরকার গঠনের জন্য ১৫১টি আসন প্রয়োজন হয়। এ অবস্থায় বিএনপি স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি জামায়াতে ইসলামীর সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করে এবং কেবল খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। বিএনপি সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত বেশ কয়েকটি উপনির্বাচনে যেমন- ১৯৯৪ সালের মাঝরার উপনির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ উঠে। দলীয় সরকারের অধীনে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান আন্দোলন সম্বন্ধে নয় বলে রাজনৈতিক মহলে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়। ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে সকল দল ঐক্যবদ্ধ হয়। বিএনপি তা অগ্রহ্য করে ১৯৯৬ সালে এককভাবে বিরোধী দলগুলোর অংশগ্রহণ ছাড়াই নির্বাচন করে। উক্ত নির্বাচন জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা না পাওয়ায় ২৬শে মার্চ ১৯৯৬ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল সংসদে পাস হয় এবং ৩০শে মার্চ বিএনপি সরকার পদত্যাগ করে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হন বিচারপতি হাবিবুর রহমান। এ সরকারের অধীনে ১২ই জুন ১৯৯৬ সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৪৬টি আসন লাভ করে। জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগকে সরকার গঠনে সমর্থন প্রদান করে এবং বঙ্গবন্ধু কল্যাণ শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। মেয়াদ শেষে আওয়ামী লীগ ২০০১ সালে দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ২০০১ সালের ১লা অক্টোবর অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির নেতৃত্বাধীন ৪ দলীয় জোট ২১৯টি আসন লাভ করে সরকার গঠন করে। নির্ধারিত মেয়াদ শেষে ২০০৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের

#### কাজ

দলগত : কীভাবে বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনর্বাচা করে তা বর্ণনা কর।

প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ নিয়ে সংকট তৈরি হয়। রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহমেদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠনবিধি উপেক্ষা করে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নিজের উপর নেন। এর ফলে সংকট আরও ঘনীভূত হয়। বিরোধী দল বিধান অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন ও সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। এরূপ অবস্থায় ২০০৭ সালের ১১ই জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহমেদ প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে সরে দাঁড়ান এবং দেশে জুরুরি অবস্থা জারি করেন। ১২ই জানুয়ারি সেনাবাহিনীর সমর্থন নিয়ে ড. ফখরুল্লাহ আহমদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হন। এ সময়ে কার্যত সেনাবাহিনী দেশ পরিচালনা করতে থাকে। দেশের দুটি প্রধান দলের দুই নেতৃত্বকে প্রেরিত করা হয়। রাজনৈতিক সংস্কারের নামে বিরাজনাতিকীকরণ এবং সেনাশাসন দীর্ঘস্থায়ী করার নীলনকশা নিয়ে তারা অগ্রসর হয়। কিন্তু সেনাশাসনের অতীত তিঙ্ক অভিজ্ঞতা থাকায় জনগণের প্রতিবাদ ও বিরোধিতায় তা সফল হয়নি। অতঃপর নির্বাচন কমিশন ছবিযুক্ত নতুন ভোটার তালিকা ও আচরণবিধি প্রণয়ন শেষে ২০০৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে। উক্ত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট ২৬২টি আসন পেয়ে সরকার গঠন করে এবং শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। মহাজোট সরকার দেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের লক্ষণীয় অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে শাসনকার্য পরিচালনা করেছে। সাংবিধানিক ধারাবাহিকতায় ৫ই জানুয়ারি ২০১৪ দশম জাতীয় সংসদ এবং ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৮ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উভয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট বিজয়ী হয়ে বর্তমানে সরকার পরিচালনা করেছে।

### বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রা

মুক্তিযুদ্ধে ধ্বংসয়জ্ঞের পর বাংলাদেশ দারিদ্র্যপীড়িত দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৭০ শতাংশ। সরকারি বিভিন্ন নীতি ও কৃষক-শ্রমিকসহ জনগণের সম্বলিত চেষ্টায় বাংলাদেশে গত ৪৬ বছরে দারিদ্র্যের হার ২৪ শতাংশে নেমে এসেছে। ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত গাঁচটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য ছিল দারিদ্র্য বিমোচন। সরকারের গৃহীত বিভিন্ন নীতি দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষকে দারিদ্র্য জয়ে সহযোগিতা করেছে। দারিদ্র্য হ্রাসের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানব উন্নয়ন সূচকে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে। বাংলাদেশের মানব উন্নয়ন সূচক দক্ষিণ এশিয়ার পাকিস্তান, নেপাল ও আফগানিস্তানের তুলনায় ভালো।

উন্নয়ন সহযোগীদের পরামর্শক্রমে প্রণীত ‘জাতীয় দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র’ ও ‘জাতীয় দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র-২: দিন বদলের পদক্ষেপ’ বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশকে ২০২১ সাল নাগাদ একটি শক্তিশালী মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত করার লক্ষ্য নিয়ে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। গত তিন দশকে বাংলাদেশের খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে তিন গুণ। তৈরি পোশাক খাতে সারা বিশ্বে রম্পতানি বাণিজ্যে বাংলাদেশ এখন দ্বিতীয় অবস্থানে।

দারিদ্র্য বিমোচন ছাড়াও সামাজিক বিভিন্ন খাতে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। বিশেষত শিক্ষার প্রসার, শিশু মৃত্যুহার হ্রাস ও নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে বলে মত প্রকাশ করেছেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. অর্মর্ট্য সেন। গত চার দশকে বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুহার প্রতি এক হাজারে ১৮৫ থেকে কমে ৪৮ জনে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষার হার পাকিস্তান আমলের ১৭ ভাগ থেকে বেড়ে ৭৩ ভাগে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়নের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এসেছে। সৃজনশীল পদ্ধতির মূল্যায়ন ব্যবস্থা, শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। বর্তমান সরকার একসাথে ২৫ হাজারের অধিক রেজিস্ট্রার্ড প্রাইমারি এবং প্রায় ৩ শত কলেজ সরকারিকরণ করেছে। এটি শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধনে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। স্কুলে শিক্ষার্থী ভর্তি ও বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার পাসের হার অনেক বেড়েছে, শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার কমেছে ও শ্রেণিতে নারী শিক্ষার্থীর উপস্থিতির হার বেড়েছে। এছাড়া একীভূত শিক্ষা গ্রহণ করার ফলে ‘সবার জন্য শিক্ষা’ কার্যক্রম সফলতা পেয়েছে। যার ফলে তিশেন-২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকার এগিয়ে যাচ্ছে।

নারীর ক্ষমতায়ন ও স্বাস্থ্য রক্ষায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো— মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান, টিকা দান, দুর্ঘ নারীদের সহায়তা প্রকল্প, নারী শিক্ষা বিস্তারে উপবৃত্তি প্রদান ইত্যাদি। এসব পদক্ষেপ নারীর সার্বিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব রেখেছে। ২০১১-২০১২ অর্থবছরে ১ লাখ ১২ হাজার প্রসূতি নারীকে অনুদান দেওয়া হয়। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতায় ২০১০-২০১১ অর্থবছর থেকে শহর অঞ্চলের কর্মজীবী মায়েরা ‘ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল’ থেকে অর্থ সাহায্য পাচ্ছেন। নারীর প্রতি পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে ২০১০ সালে প্রণীত হয়েছে ‘পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন’। নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় এ আইনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে বিশেষত দরিদ্র মানুষের খাদ্য প্রাপ্তি ও পুষ্টির জন্য প্রণীত হয় ‘খাদ্য নীতি ২০০৬’। প্রাক্তিক ও গ্রামীণ জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা দিতে সরকার বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি, যেমন—কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা), ভিজিএফ, ভিজিডি, চিআর প্রভৃতি পরিচালনা করেছে। এসব কর্মসূচির মাধ্যমে সরকার বছরে প্রায় ২০ লাখ টন চাল দুর্ঘ, নিরাম, প্রতিবন্ধী, শ্রমিকদের সরবরাহ করে। এছাড়া সরকার মুক্তিযোদ্ধাভাতা, বয়স্কভাতা, বিধবাভাতা, প্রতিবন্ধীভাতার মতো কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা এবং পরিবেশ ও দুর্যোগ মোকাবিলা বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম ও পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে সরকার ইতোমধ্যে প্রশংসনীয় অর্জন করেছে।

শিশুদের সুরক্ষা ও তাদের জীবন-বিকাশে সরকার ২০১১ সালে প্রণয়ন করেছে ‘জাতীয় শিশু নীতি ২০১১’। ১৮ বছরের কম বয়সী সকল ব্যক্তিই এ নীতি অনুযায়ী শিশু। জবরদস্তিমূলক ভারী ও বৌকিপূর্ণ কাজে শিশুদের ব্যবহার এ নীতিতে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

কাজ  
একক : সামাজিক নিরাপত্তা  
কর্মসূচির তালিকা তৈরি কর।

কাজ  
একক : বাংলাদেশ সরকারের উত্তেব্যোগ্য আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে তিশেন-২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের যোগসূত্র স্থাপন কর।

পথশিশু ও বিপথগামী শিশুদের বিকাশে পৃথক ব্যবস্থা রাখার কথা বলা হয়েছে। সাংস্কৃতিক অগ্রগাম্যতায়ও বাংলাদেশ পিছিয়ে নেই। মাতৃভাষা বাংলা আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার মর্যাদা পেয়েছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে বাংলা ভাষা জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষায় পরিণত হবে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি যে বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির জন্য এ দেশের ছাত্র ও সাধারণ মানুষ রক্ত দিয়েছিল, আজ সে দিনটি ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত। এটি আমাদের দেশ ও জনগণের জন্য বড় অর্জন। বাংলাদেশের বাংলা বর্ষবরণ উদযাপনে যে মঙ্গলশোভায়াত্রার আয়োজন করা হয় তা ‘ইন্ট্যানজিবল হেরিটেজ’ হিসেবে ইউনেস্কোর বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান পেয়েছে। ফলে আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

## অনুশীলনী

### সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. মুজিবনগর স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের কাঠামোটি ছকে উপস্থাপন কর।
২. স্বাধীনতা অর্জনে গণমাধ্যমের ভূমিকা চিহ্নিত কর।
৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা লেখ।
৪. ১৯৯০ সালে গণঅভ্যুত্থানের মূল কারণ কী?
৫. ‘স্বাধীনতা আমাদের দেশ ও জনগণের সবচেয়ে বড় অর্জন।’- কথাটির পক্ষে তোমার যুক্তিগুলো লেখ।

### বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. স্বাধীনতা অর্জনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান বর্ণনা কর।
২. যুদ্ধবিধ্বন্ত দেশ গঠন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।
৩. ১৯৭২ সালের স্থবিধানে বর্ণিত মূলনীতিসমূহ ব্যাখ্যা কর।
৪. জেনারেল এরশাদের নির্বাচন পদ্ধতি মূল্যায়ন কর।

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. মুজিবনগর সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী কে ছিলেন?
  - ক. এম. মনসুর আলী
  - খ. তাজউদ্দীন আহমদ
  - গ. খন্দকার মোশতাক আহমেদ
  - ঘ. এ.এইচ.এম. কামালুজ্জামান
২. মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিশ্ব জনমত গঠনের জন্য সরকার ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব-
  - i. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পরিচালনা করেন
  - ii. গেরিলা যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন
  - iii. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বক্তব্য রাখেন
 নিচের কোনটি সঠিক ?
  - ক. i ও ii
  - খ. ii ও iii
  - গ. i ও iii
  - ঘ. i, ii ও iii